পাকিস্তান : আমার ইতিহাস

ইমরান খান
অনুবাদ : শাইখুল ইসলাম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

অনুবাদকের কথা

আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের পশ্চাদপদতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূল কারণ, এবং এগুলোর বাস্তব সমাধান প্রসঙ্গে ইমরান খান যেসব কথা বলেছেন, তা মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আপাদমস্তক ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত ইমরানের ইসলামের দিকে ফিরে আসা এবং তার উপমহাদেশীয় পরিবারিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মায়ের নামে ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান পাক-ভারত উপমহাদেশের হাজার হাজার তরুণের মনে উৎসাহ জাগাবে। ইমরানের পেশাগত জীবনের উত্থন-পতন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তরুণদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকা, দৃঢ় মনোবল, সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বোপরি সকল কাজে মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। ইমরান তার জীবন অভিজ্ঞতা লব্ধ এসব কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য হাতেকলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন। লিখেছেন আত্মজীবনী 'Pakistan : A Personal History'।

হাজারও তরুণের কাছে ইমরান ক্রিকেট মাঠের অধিনায়ক এবং বিশ্বকাপ বিজয়ী নায়ক হিসেবে বিবেচিত। তার প্রতি আমি ফোকাস রাখা শুরু করেছিলাম ক্যারি প্যাকারের রঙ্গীন পোশাকে ক্রিকেট খেলা শুরুর সেই দিনগুলো থেকে। তারপর ভারত, ইংল্যান্ড, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ সফর, নেহেরু কাপে তার বিরোচিত নেতৃত্ব দেখেছি। ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপের উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় সাধারণ মানের এক পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইমরান যেভাবে একের পর এক বিরত্বপূর্ণ বিজয় ছিনিয়ে এনে দিয়েছেন, তাতে তার প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও দায়বদ্ধতার এক অনন্য নমুনা ফুটে উঠেছে। পশতুন শৌর্য ও নেতৃত্বের গুণাবলির সাথে যেন আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও শালীনতার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এই আত্মজীবনীতে ইমরান খানের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে পাকিস্তানি ও বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে; বিশেষত মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত ঘটনাবলি। ইমরান পুরো বই লিখেছেন ধারা বর্ণনার স্টাইলে এবং প্রয়োজনীয় ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ-সুলভ মতামত দিয়েছেন। বইটির প্রতিটি পাতায় পাঠকবৃন্দ ইমরানের উদারনৈতিক চিন্তাধারা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং সবার ওপরে মানবিকতাকে স্থান দেওয়ার মানসিকতাকে খুঁজে পাবেন। ইমরান একজন গর্বিত মুসলমান। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, প্রকৃত ইসলামি আদর্শের মধ্যেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও বৈশ্বিক জীবনের মুক্তি নিহিত। তিনি গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, আইনের শাসন,

সহনশীলতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর আস্থাকে সবকিছুর ওপর স্থান দিয়েছেন এবং যেকোনো দেশের এগিয়ে চলার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে সারাবিশ্বে এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইমরান যে কর্মসূচি পেশ করেছেন, তা এক কথায় অনন্য।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইমরানের বিভিন্ন মন্তব্যে তার সুবিবেচনাবোধ ফুটে উঠেছে। তৎকালীন পাকিস্তানের এ অঞ্চলের জনগণের প্রতি শাসকশ্রেণীর বিমাতাসুলভ আচরণকে তিনি সাধারণ মানুষদের প্রতি অভিজাত গোষ্ঠী কর্তৃক চিরাচরিত বঞ্চনার মনোভাব বলে মনে করেন। ইমরানের ভাববাদ ইকবালের চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। ইকবালের বাণীর মাঝেই তিনি পাকিস্তান তথা মুসলিম উম্মাহর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে তার পরিকল্পনা এই বইতে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তার চিন্তা ও কর্ম পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ; তা সত্ত্বেও জীবন চলার পথে যেসব ভুল করেছেন, সেগুলো অকপটে স্বীকার করেছেন। এতে রাজনীতিবিদ হিসেবে তার সততা ও আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে। তার নেতৃত্বে পাকিস্তান এগিয়ে যাবে এবং তার সততা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ ও আদর্শ সমাজ গঠনে নেতৃত্বদানে ইচ্ছুক উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের জন্য বইটি এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

(কেন অনুবাদ করলেন? কতদিন লেগেছে অনুবাদে, কী কী বিষয় আছে ভেতরে, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে কীভাবে সংযুক্ত হলেন– এসব পয়েন্ট এখানে থাকা উচিত, এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ প্রদান)

শাইখুল ইসলাম

পুস্তক পরিচিতি

১৯৪৭ সাল। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র পাঁচ বছর পর ইমরান খানের জন্ম। পাকিস্তানের ইতিহাসের সাথেই তার জীবন বিবর্তিত হয়েছে। অর্থ ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ দেশের অভিজাত শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক অবদমিত পাকিস্তান বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর ইসলামি দেশ; তবুও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও আপন মিত্র আমেরিকার নিয়মিত বোমা হামলা থেকে নিজ জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম। পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেনকে অনেক বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছে– এমন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে এখন আমেরিকার সাথে সম্পর্ক কেবল খারাপের দিকেই যাবে। কীভাবে পাকিস্তান অবিচার ও অস্থিতিশীলতার শেষ প্রান্তে এমন এক সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিণতিতে পৌঁছল?

ইমরান খান আপন স্মৃতি-প্রিজমে প্রতিসরিত তথ্যকণিকার আলোতে দেখা দেশের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। পতনোন্মুখ ব্রিটিশ রাজের সময়কালে রচিত দেশের বুনিয়াদি ধারণা থেকে তিনি শুরু করেছেন। মুসলিম বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এসব বিষয়ে নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখার পাশাপাশি সাধারণ পাকিস্তানিদের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন।

ইমরান নিজের পারিবারিক ইতিকথা এবং দেশের আনাচে-কানাচে তার ব্যাপক সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, 'পাকিস্তান : আমার নিজের ইতিহাস' বইতে অনন্য এক অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের কাছে অপরিচিত ভিন্ন এক পাকিস্তানকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের এই বুনন থেকে আমরা ইমরান খানের ব্যক্তিগত জীবন – লাহোরে সুখী শৈশব, অক্সফোর্ডে শিক্ষাজীবন ও অসাধারণ ক্রিকেট ক্যারিয়ার, জেমিমা গোল্ডস্মিথের সাথে বিয়ে, তার জীবনে মায়ের প্রভাব ও ইসলামি বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারব। ইমরানের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত ঐতিহাসিক পর্বের আখ্যান এবং বর্তমান জনহিতকর ও রাজনৈতিক কার্যক্রম, উভয় বর্ণনাই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তার লেখনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

সূচিপত্র

অধ্যায়–১ : বেহেশতেও কি ক্রিকেট খেলতে পারব? (১৯৪৭-১৯৭৯)

অধ্যায়–২ : বিপ্লব (১৯৭৯-১৯৮৭)

অধ্যায়–৩ : মৃত্যু ও পাকিস্তানে আধ্যাত্মিক জীবন (১৯৮৭-১৯৮৯)

অধ্যায়–৪ : আমাদের ব্যর্থ গণতন্ত্র (১৯৮৮-১৯৯৩)

অধ্যায়–৫ : 'ছদ্মবেশী ফেরেশতা' হাসপাতাল নির্মাণ (১৯৮৪-১৯৯৫)

অধ্যায়–৬ : আমার বিয়ে (১৯৯৫-২০০৪)

অধ্যায়–৭ : সেনাপতি (১৯৯৯-২০০১)

অধ্যায়–৮ : ৯/১১ হামলার পর পাকিস্তান

অধ্যায়–৯ : উপজাতীয় অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ : আমার সমাধান

অধ্যায়–১০ : ইকবালকে নতুনভাবে আবিষ্কার

অধ্যায়–১১ : পরিশিষ্ট : নয়া পাকিস্তান (২০১২-২০১৯)

অধ্যায়—১
বেহেশতেও কি ক্রিকেট খেলতে পারব?
(১৯৪৭-১৯৭৯)

পাকিস্তানের বাইরে আমি মূলত একুশ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্যই পরিচিত। কিন্তু নিজ দেশে আমি একটি দলের প্রধান, যারা রাজনৈতিক অভিজাতদের প্রাধান্য খর্ব করার সংগ্রামে লিপ্ত। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এ শ্রেণি দেশকে খোদা প্রদত্ত সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে কোণঠাসা করে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট মোশাররফের মতো সামরিক স্বৈরাচার অথবা ভুট্টো ও শরিফের মতো জমিদারপরিবার কর্তৃক পালাক্রমে শাসিত হয়ে পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। একটি ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, বর্তমানে পাকিস্তান এমন এক দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে রাজনীতি হচ্ছে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মতো একটা ব্যাপার। এখানে ক্ষমতাসীন শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জকারী যে কাউকে, এমনকী আমার মতো বহুপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিকেও ইচ্ছামত গ্রেফতার ও সহিংস হুমকি দেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বদেশভূমি হিসেবে এবং ইসলামের সমতা নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান এখনও এক ভঙ্গুর রাষ্ট্র। এর উত্তর-পূবে কাশ্মীর। অঞ্চলটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত, যা স্বাধীনতার পর থেকেই দেশ দুটির মধ্যে সহিংস বিরোধের কারণ, হয়ে রয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ পশতুনের

কেন্দ্রভূমি খাইবার পাখতুনখোয়া ও কেন্দ্র-শাসিত গোত্রীয় অঞ্চলকে[১] জর্জরিত করছে। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল, রূক্ষ, অনাবিষ্কৃত ও বিরল জনবসতিপূর্ণ বেলুচিস্তান প্রদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী তৎপরতায় উত্তপ্ত। দক্ষিণে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের উপকূল ঘেসে আরব সাগর বহমান। সিন্ধুর প্রাদেশিক রাজধানী করাচি বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত। তাদের মধ্যে রয়েছে পশতুন অভিবাসী এবং মোহাজির বা রিফিউজি নামে পরিচিত দেশভাগের সময় সীমান্তের ওপার থেকে আগত মুসলমানদের বংশধরেরা। অন্যদিকে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোকের বাসস্থান পাঞ্জাব পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তি ও সমৃদ্ধির একচেটিয়া সুবিধাভোগী হওয়ায় অন্যান্য প্রদেশের ক্ষোভের কারণ, হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মতে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই আমার দেশের দুর্দশার সূচনা হয়, যখন আমরা আমাদের মহান নেতা জিন্নাহকে হারাই। 'পাকিস্তান' অর্থ পবিত্র ভূমি, আমার জন্মের সময় এই দেশের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। দেশ নিয়ে আমরা তখন যারপর নাই গর্বিত ও আশাবাদী ছিলাম। আমরা ছিলাম পতোন্মুখ ব্রিটিশ রাজ্যের হাত থেকে মুসলমানদের জন্য আদায় করে নেওয়া এক নয়া দেশ। আমাদের মন থেকে ছলনাপূর্ণ ঔপনেবেশিক অপমান এবং স্বাধীন ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় দূরিভূত হয়েছে। আমরা হলাম এক মুক্ত জনসমষ্টি, যারা এখন অবাধে উপমহাদেশের মিনারে একসময় পত পত করে উড়া ইসলামি সংস্কৃতির নব উন্মোচন করতে সক্ষম। সমতা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রচিত ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও আমাদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা ছিল- গণতন্ত্র কোনো ধরনের ধর্ম-রাজ নয়। মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আদর্শ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হলে এর মাধ্যমে আমরা অপার সমৃদ্ধি অর্জনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হবো-ন এমনটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। অনেক পরে উপলব্ধি করলাম, আমাদের মতো আনকোরা নতুন দেশেও এমন স্বপ্ন পূরণ করা কত কঠিন যেখানে ঐতিহাসিক কট্টর মনোভাব তখনো দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু বছর পরিক্রমায় আমরা নিজস্ব নিদারূণ ইতিহাস তৈরি করে নিলাম এবং পাকিস্তান সৃষ্টির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমাগত দূরে চলে গেলাম।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিকড় রোপিত হয়। মোটামুটিভাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আরব সাগরের তীরে অবস্থিত সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপকূলভূমি সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলটি ইতঃপূর্বে কখনো পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল না। বরং শতাব্দিকাল ধরে এলাকাটি একের পর এক বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইংরেজরা উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যদিও ১৮৮০ দশক হতে সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশী লক্ষ লক্ষ মানুষের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান।

---

[১]. FATA (the Federally Administered Tribal Areas)

এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যারা তাদের সংগ্রামের প্রথম দিকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে। ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে চায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বৃটেনকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়। ফলে এ সময় যে সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্ত যেতোনা', তার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতব্যাপী ইংরেজ শাসন অবসানের লক্ষ্যে তাদের সাথে দর কষাকষি করতে থাকে। তারা চেয়েছিল সমগ্র উপমহাদেশ মিলে একটি দেশ হোক। এখান থেকেই দুটি জাতির ইতিহাস ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করে। একটা হিন্দু জাতীয়তাবাদী পন্থা, অন্যটি ১৯২০-৩০ দশক জুড়ে ভারতের বিভিন্ন শহর ও প্রদেশে সংঘটিত সহিংসতা লক্ষ্য করে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুসৃত ভিন্ন পন্থা। এ পক্ষের অংশ হিসেবে বিশেষভাবে দুই ব্যক্তি জিন্নাহ ও আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নয় বছর আগে ইকবাল মারা যান। স্বপ্নদর্শী এ কবি ও দার্শনিকই পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। ১৯৩০ সালে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতি প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন–

> 'আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটি একক রাষ্ট্রে হিসেবে দেখতে চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে বা বাইরে একটি স্ব-শাসিত ও সংহত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম রাষ্ট্রের গঠন আমার কাছে মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাগ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।'
>
> 'ভারতীয় মুসলমান তার নিজস্ব ভারত ভূমিতে আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোকে পূর্ণতার সাথে এবং বাধাহীনভাবে বিকাশ লাভের অধিকার রাখে।'

এমন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ইকবাল মনে করতেন যে, মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য (খুদি) বিকাশের জন্য এটি অতি আবশ্যকীয় এক পর্যায়।

ইকবাল কেবল একটি স্ব-শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রের চিন্তা করেননি, বরং তাঁর প্রগাঢ় বক্তব্য ভারতীয় মুসলমানদের ঘুম ভেঙে দেয় এবং তাদের সক্রিয় করে তোলে। নিজেদের কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনেবেশিকতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করা নয়, বরং সব ধরনের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের অনুপ্রেরণা জোগান। মানবিক সাম্য, মর্যাদাবোধ, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে মানব জাতির অধিকারের প্রতি একান্ত বিশ্বাস পোষণকারী ইকবাল শক্তিহীনদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর ও মূল্যায়িত হওয়ার প্রেরণা যোগান।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইকবালের লেখনী আমার কাছে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক মনে হলো। কোনো বিবেচনা ছাড়াই একটি স্বাধীন মডেল হিসেবে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি

প্রদর্শণ করেন। এর বিপরীতে তিনি বলেন যে, ইসলামি নিয়ম-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যেকোন সমাজ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, শান্তি ও সাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। ইসলাম বিষয়ে ইকবালের ভাষ্য সংকীর্ণ পরিসরে প্রদত্ত ইসলামের ব্যাখ্যা হতে বহুলাংশে আলাদা। ইকবালের কাছে ইসলাম শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস বা উপাসনা পদ্ধতির নাম নয়। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, বরং এ পার্থক্য জীবনের প্রতিটি মৌলিক চিন্তার দিক দিয়েও।

ইকবাল মনে করতেন, বংশগৌরব বা জাত্যাভিমান মুসলমানদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর মতে, 'সাম্য, সংহতি ও স্বাধীনতা' এই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ইসলামে কোনরূপ যাজক বা অভিজাত-তন্ত্র নেই। আর মানুষের যোগ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া (ন্যায়পরায়ণতা)। নবি মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

'মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই, যারা আল্লাহকে ভয় করে।'

অন্য কথায়- যারা মনুষ্যত্ব গুণসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ,তারাই আল্লাহকে ভয় করে। কারণ, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন সে বিশ্বাস করে; একদিন তাঁর কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। তাই সে অনুযায়ী তাকে চলতে হবে।

ইকবালের দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সমষ্টিই ইসলামি কালচার নয়। বরং এটি এক আদর্শিক মানদণ্ড, যার ভিত্তি হচ্ছে কুরআনে সন্নিবেশিত ন্যায়নিষ্ঠ নীতিমালা। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের খোদাপ্রদত্ত সম্ভাবনা পুরোপুরি উপলব্ধি করার নিমিত্তে ইসলাম তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই দর্শনের স্বপক্ষে ইকবাল একটি 'কর্মের নকশা' উপস্থাপন করেছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজকে সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিকাশের দিকে চালিত করে।

ইকবাল ছাড়াও যেসব ব্যক্তি মুসলমানদের পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহনের আহ্বান জানান এবং এ উদ্দেশ্যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, (যেমন, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান) তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যতদিন হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে থাকবে, ততদিন একটি আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব হবে না।

তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তাতে কেবল শ্রেণিভেদ প্রথা ও যাবতীয় সামাজিক বৈষম্যই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, বরং এর বাইরেও ইসলামি আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার মতো সাহসী উদ্যোগ ভারতের মতো দেশে অর্জন করা সম্ভব ছিল না, কেননা সেখানে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। এ সময়, ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল ইউরোপীয় ঔপনেবেশিকের শাসনাধীন। ইসলামি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের মুসলিমদের প্রয়োজন ছিল একটি রাষ্ট্রের; অথবা নিদেনপক্ষে

কোনো একটি রাজ্যের, যেখানে মুসলমানরা নিজেদের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং আপন বিশ্বাসের সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পাবে।

১৯৩৮ সালে ইকবালের মৃত্যুর পর সেই কাংখিত দেশ সৃষ্টির দায়িত্ব বর্তায় আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর। বহু মানুষ ইকবালের জানাজায় অংশ নেন, আমার পিতা ছিলেন তাদের একজন।

ইকবাল একজন ভাববাদী মানুষ, তথাপি কুরআনের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবন যাপনের উপায় সম্পর্কে তিনি মুসলমানদের বাস্তব দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। জিন্নাহও প্রয়োগবাদের সাথে ভাববাদের সন্মিলন করেছেন।

> 'কিছুটা বিধিবদ্ধ ও খুঁতখুঁতে, খানিকটা নির্লিপ্ত ও কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ তথা প্রশান্ত অহংকার তাঁর ভেতরকার অকৃত্রিম ও আকুল মনন, সংবেদনশীল ও স্নেহময় অনুভব, শোভন ও হৃদয়গ্রাহী স্বভাবকে ঢেকে রাখে; তাঁর পার্থিব প্রজ্ঞার অবশ্যম্ভাবী পবিত্রতা ও নির্মলতা এক নম্র ও মহান ভাববাদকে লুকিয়ে রাখে'-

লিখেছেন কংগ্রেস পার্টির প্রথম নারী সভাপতি সরোজিনী নাইডু।

শুরুতে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির সদস্য হিসেবে জিন্নাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত এবং অখন্ড ভারতের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরে তিনি মোহন দাস গান্ধীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কে যখন ইসলামি খিলাফতের অবসান ঘটে, তখন গান্ধী তা পুনর্বহালের আন্দোলনে নেতৃত্বে প্রদান করেন; তিনি এটাকে ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ করার এক উপায় হিসেবে দেখেন। কিন্তু জিন্নাহ এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেস নেতা জওহর লাল নেহেরুকে অপছন্দ করতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, নেহেরু ব্রিটিশ ভাইসরয় লুই মাউন্টব্যাটেনের সাথে নিজের ঘনিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে জিন্নাহ কর্তৃক প্রণীত আইনগত সাংবিধানিক পন্থায় বিশেষ কমিশন নিয়োগের কোনরূপ সদিচ্ছা মাউন্টব্যাটেনের ছিল না। মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনা নেহেরুর সাথে এতটা অন্তরঙ্গ ছিল যে, পরবর্তী সময়ে অনেক পাকিস্তানি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফলে ব্রিটিশ নীতি হিন্দুদের পক্ষে চলে যায়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহর লাল নেহেরু, মোহন দাস গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলিম সদস্য মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি পরে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন - এ চারজন ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো নেতা। যদিও তাদের প্রত্যেকেই ভারতের জনগণের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা লালন করতেন। গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁরা একইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে, তাদের

সৃষ্ট নতুন দেশগুলো ধর্মনিরপেক্ষ হবে না, বরং ধর্ম সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গান্ধী বলেন–

> 'যারা বলে ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, তারা জানে না ধর্ম কী।'

তিনি মনে করতেন ধর্মহীন রাজনীতি অনৈতিকতার নামান্তর। কয়েক বছর পর, ১৯৪৮ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানে প্রদত্ত বক্তৃতায় জিন্নাহ এ কথা পুনর্ব্যক্ত করেন–

> 'আমরা অবশ্যই বিশ্বের কাছে সত্যিকার ইসলামি ধারণার আলোকে রচিত মানবিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করব। মুসলমান হিসেবে এভাবে আমরা আমাদের মিশন পূর্ণ করব।'

জিন্নাহ ও গান্ধী উভয়ই বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুবাদের মোকাবিলায় ধর্ম কর্তৃক প্রচারিত মমতার বাণী এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হতে পারে।

খিলাফত আন্দোলনের পর ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে। ১৯২০ এর দশকের শেষভাগ থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লড়াই এর জেরে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন কর্তৃক অবাস্তব দাবির সূচনা হতে থাকে। অধ্যাপক ফ্রান্সিস রবিনসনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এরূপ একগুঁয়েমির অর্থ হচ্ছে-

> 'সব ধরনের চেষ্টার পরও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গঠনে ব্যর্থতার জন্য হিন্দু পুনরুত্থানকামীরাই অধিকতর দায়ি।'

অখন্ড ভারতে মুসলমানরা নিরাপদে থাকবে, এমন কথা জিন্নাহ আর কখনো বিশ্বাস করতে পারেননি।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, লাহোরে মুসলিম লীগের এক সভায় দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে জিন্নাহ সম্মতি প্রদান করেন; যার একটি হিন্দুদের জন্য, অন্যটি মুসলমানদের জন্য। আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন যে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের আসল প্রকৃতি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে, তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। শাব্দিক অর্থে ধর্ম বলতে যা বুঝায়, এ দুটো ধর্ম ঠিক সে অর্থে কোনো ধর্ম নয়। বরং এ দুটি একেবারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থা। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটি অভিন্ন জাতীসত্ত্বা গড়ে তোলার ধারণা দিবাস্বপ্ন বৈ কিছু না। তিনি ঘোষণা করেন–

> 'হিন্দু ও মুসলিম দুটি ভিন্ন দর্শন ও সামাজিক প্রথার অন্তর্গত। তাদের রয়েছে সতন্ত্র সাহিত্য ধারা। তারা একে অপরের সাথে বিবাহ-শাদী এবমনকি একত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্তও করে না। বাস্তবে তারা এমন দুটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ধারক ও বাহক, যা বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ে এদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি-ই